



‘कठसुद्धि’

संस्कृत शुद्धउच्चारणेर सरलतम विधि

मुजय विद्यार्थी

वेदज्योति वृक्षवाहिनी



কণ্ঠশুদ্ধি

ॐ

কণ্ঠশুদ্ধি

(সংস্কৃত শুদ্ধউচ্চারণের সরলতম বিধি)

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস

বেদজ্যোতি রক্ষাবাহিনী

লেখক

সুজয় বিদ্যার্থী



কণ্ঠশুদ্ধি

প্রকাশক. : বেদজ্যোতি রক্ষাবাহিনী।

প্রথম সংস্করণ : ৯ই নভেম্বর ২০২৫ ইং

মূল্য : বিনামূল্যে ই-বুক কপি।



© এই পুস্তক “বেদজ্যোতি রক্ষাবাহিনী” দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ও৩ম্ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ

সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে চান তাহলে পাণিনীয় শিক্ষা পড়ুন। সংস্কৃত উচ্চারণ বিষয়ে খুব সুন্দর ভাবে ঋষি পাণিনি তার পাণিনীয় শিক্ষায় তুলে ধরেছেন। আমাদের তার শিক্ষা গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা অত্যাৱশ্যক, যদি আমরা উচ্চারণ শুদ্ধ করতে চাই। যদি এই শিক্ষা গ্রন্থটি প্রাপ্ত করতে সমস্যা হয় কিংবা বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অত্যন্ত সহজ লভ্য ও সুন্দর ব্যাখ্যা সহ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর বর্ণোচ্চারণশিক্ষা পড়তে পারেন। যদি আপনার তাতেও ক্লিষ্ট অনুভব হয়, তাহলে আমার এই কণ্ঠ শুদ্ধি পড়ুন। উচ্চারণের জন্য পাণিনীয় শিক্ষার অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো তুলে ধরেছি, যাতে করে আপনি সহজেই সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারবেন।

—সুজয় বিদ্যার্থী

কণ্ঠশুদ্ধি

বর্ণ পরিচয়

প্রশ্ন - বর্ণ কয়টি?

উত্তর – বর্ণাস্ ত্রিসষ্টিঃ (বর্ণ ৬৩টি)

স্বরবর্ণ

হ্রস্ব	দীর্ঘ	প্লুত
অ	আ	অত
ই	ঈ	ইত
উ	ঊ	উত
ঋ	ঠ	ঋত
৳(ল্)	৳	৳ত
৳	এ	এত
৳	ঐ	ঐত
৳	ও	ওত
৳	ঔ	ঔত

কণ্ঠশুদ্ধি

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম

আয়োগবাহ রূপ

অনুস্বার (ং)	হ্রস্ব (ঔ)
বিসর্জনীয় (ঃ)	দীর্ঘ (ং)
জিহ্বা মূলীয় (ঋ)	অনুনাসিক (ঁ)
উপধ্বানীয় (ঌ)	অক্ষর (ল)
	এই চারটিকে যম-ও বলা হয়।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য :-

১. স্বরবর্ণ – স্বয়ং রাজভে ইতি স্বরাঃ

কণ্ঠশুদ্ধি

অর্থ—যে সকল অক্ষর নিজে নিজে উচ্চারিত হয় তাদেরকে স্বরবর্ণ বলে। এদের মাত্রা ভিত্তিক তিন প্রকারের হয়, যথা **হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লত**। **বর্ণোচ্চারণকালপরিমাপকান্ধাংশো মাত্রা** (উদয়নাচার্য) অর্থাৎ বর্ণোচ্চারণ-কালের পরিমাপক অন্ধাংশ কে মাত্রা বলে। কোনো এক আচার্য বলেন – **নিমেষো মাত্রাকালঃ...** নিমেষ অর্থাৎ চোখের পলকের যে অনৈচ্ছিক প্রতিফলন ক্রিয়া। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বর্ণোচ্চারণশিক্ষায় বলেছে “আঙুলের গোড়ায় নাড়ি একবার স্পন্দিত হতে যে সময় লাগে” [তাকে ‘মাত্রা’ বলা হয়] আধুনিক প্রেক্ষাপটে, এই একককে এক সেকেন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হ্রস্ব স্বরে এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বরে হ্রস্বের দ্বিগুণ ও প্লত স্বরে হ্রস্বের তিনগুণ। প্লত স্বরের তিনগুণ বেশি হওয়ায় ৩টিহু ব্যবহার করা হয়। যথা- **অ৩** আবার অনেক সময় **আ৩** এভাবেও লেখা পাওয়া যায়, তবে ধ্যান রাখতে হবে যেটাই লেখা থাক না কেন সময় সমান (প্লত) রূপেই জানা উচিত।

২. ব্যাঞ্জনবর্ণ- অন্বগভবতি ব্যাঞ্জমিতি। অর্থ- ব্যাঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণের অনুকরণ করে। অর্থাৎ বলা যায় স্বরবর্ণ ব্যাতিত যার উচ্চারণ সম্ভব নয়।

কণ্ঠশুদ্ধি

স্পর্শ ব্যাঞ্জনবর্ণ – ক-বর্ণ থেকে প-বর্ণের যে ২৫ টি বর্ণ এদের উচ্চারণ তাদের নিজস্ব স্থানে জিহ্বা সম্পূর্ণ স্পর্শ হয় বলে এদের স্পর্শ বর্ণ বলে।

অন্তঃস্থ ব্যাঞ্জন- য়,র,ল ও ব এই চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বলা হয়, এদের উচ্চারণ স্থানের সাথে জিহ্বার কিঞ্চিৎ স্পর্শ হয়।

উষ্ম ব্যাঞ্জন- শ,ষ,স ও হ এই চারটি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বা উষ্ম ব্যাঞ্জন বলে। এদেরও উচ্চারণ স্থানের সাথে জিহ্বার কিঞ্চিৎ স্পর্শ হয়, সম্পূর্ণ স্পর্শ হয় না।

উচ্চারণ স্থানাঙ্গি গূঢ় বিষয়: -

অকুহবিসর্জনীয় কণ্ঠঃ – অর্থাৎ অ,আ,অ৩ ক,খ,গ,ঘ,ঙ উষ্ম বর্ণের হ এবং (:) বিসর্জনীয় এদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। এদের মধ্যে অ,আ,অ৩ এবং সমস্ত স্বরবর্ণকে বিবৃতকরণ জানা উচিত [বিবৃতকরণাঃ স্বরাঃ] অর্থাৎ বর্ণের উক্ত উচ্চারণ স্থান থেকে জিহ্বা পৃথক থেকেই উচ্চারিত হয়। , কিন্তু **সংবৃত্ত্বকারঃ** হ্রস্ব অ-কারকে সংবৃত্ত প্রয়ত্ত যুক্ত বলা হয়েছে। যদিও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এর ভাষ্য করছেন- অ-কারের সংবৃত্ত প্রয়ত্ত আছে। কারণ

কণ্ঠশুদ্ধি

এর উচ্চারণ কণ্ঠ কে সংকোচ করে করতে হয়। কিন্তু এর ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কার্য করার সময় বিবৃত প্রয়োত্বই হবে।(বর্ণোচ্চারণশিক্ষা)। এছাড়াও পাণিনীয় শিক্ষার পাঠ ভেদে বিবৃতি প্রয়োত্বেরও কিছু উপভেদ পরিলক্ষিত হয় যেমন – **তেভ্য এ ও বিবৃততরৌ।** - অর্থাৎ অন্য স্বরের তুলনায় **এ** এবং **ও** এই দুইয়ের অধিক বিবৃত [বিবৃততর] হয়। এবং **তাভ্যামৈ ঔ।** - অর্থাৎ **এ**, **ও** এদের থেকে **ঐ**, **ঔ** এই দুইয়ের অধিক বিবৃত [বিবৃততর] হয়।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ -এদের উক্ত স্থানে জিহ্বার সম্পূর্ণ স্পর্শ হবে। **স্পৃষ্টকরণাঃ স্পর্শাঃ** এদের উচ্চারণ তাদের নিজস্ব স্থানে জিহ্বা সম্পূর্ণ স্পর্শ হয় বলে এদের স্পর্শ বর্ণ বলে। কিন্তু **হ**-কার উচ্চারণে তার স্থানের সাথে জিহ্বার কিঞ্চিৎ স্পর্শ হওয়া উচিৎ কারণ **ঈষদ্বিবৃতকরণা উশ্মাণঃ।** - অর্থাৎ উশ্ম বর্ণ- **শ, ষ, স, হ** - এই বর্ণের নিজের নিজের স্থানের সাথে জিহ্বার কিঞ্চিৎ স্পর্শ হয়। (উদয়নাচার্য এই সূত্রের ভাষ্যে উশ্ম সংজ্ঞক **হ**-বর্ণের বিবৃত করণ মেনেছেন)। এছাড়াও কোনো এক আচার্য **হ**-কার ও **বিসর্গ** কে উরুঃস্থানীয় মেনেছেন। এরকম বিভৃত ব্যাখ্যা প্রত্যেকটা সূত্রের দিতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে তাই, করণ এবং প্রয়ত্নো বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পরবর্তী ১১ নম্বর সূত্র পর্যন্ত ব্যবহার করুন।

২. ইচুয়শান্তালব্যঃ। ই ঈ ইও, চু অর্থাৎ চ ছ জ ঝ ঞ, য এবং শ এদের উচ্চারণ তালু স্থান থেকে হয়। বাকি বৈশিষ্ট্য পূর্বের নিয়মে দ্রষ্টব্য।

৩. ঞটুরষা মূর্ধন্যাঃ। অর্থাৎ ঞ ঞ ঞও, ট-বর্ণের ট ঠ ড ঢ ণ, অন্তঃস্থ বর্ণের – র এবং উষ্ম বর্ণের ষ এদের উচ্চারণ মূর্ধা স্থান থেকে করা উচিত। কোন এক আচার্য এর স্থান দন্তমূল মনে করেন। ঞ- এর উচ্চারণ স্থান নিয়ে নিচে বিস্তারিত লেখা আছে।

৪. লৃতুলসা দন্ত্যাঃ। অর্থাৎ ল্ ল্ ল্ও, ত-বর্ণ ত থ দ ধ ন, অন্তঃস্থ বর্ণের – ল এবং উষ্ম বর্ণের স এদের উচ্চারণ স্থান দন্ত।

৫. বকারো দন্তৌষ্ঠ্যঃ। অর্থাৎ ব-কারের উচ্চারণ দন্ত্য ও ওষ্ঠ স্থান থেকে করা উচিত। কোনো এক আচার্য এর স্থান সৃষ্কিনি মেনেছেন অর্থাৎ দন্ত এবং ওষ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান। সহজ ভাবে বললে ইংরেজি তে দুই প্রকার ব-শব্দ পাওয়া যায় V এবং W । এর মধ্যে ‘ W ’ রূপী ব-ধ্বনী এর উচ্চারণও সৃষ্কিণী স্থান থেকে হয়, যেমন world শব্দের উচ্চারণ ইংরেজরা করেন।

৬. জিহ্বামূলীয় জিহ্ব্যঃ। অর্থাৎ জিহ্বামূলীয় (x ক/খ) সংজ্ঞক বর্ণের স্থান জিহ্বা মূল, অর্থাৎ এর উচ্চারণ জিহ্বা মূল থেকেই করা উচিত। বিসর্গ এবং এর বিশেষ পার্থক্য হওয়ার কথা নয়, কারণ জিহ্বা মূল ও

কণ্ঠশুদ্ধি

কণ্ঠ স্থানের বিশেষ পার্থক্য নেই। উদয়নাচার্য তার শিক্ষা-শাস্ত্রম্ এর ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন “যেখানে যেখানে স্থান রূপে জিহ্বা অথবা জিহ্বা মূলের উল্লেখ আছে, সেখানেই জিহ্বা মূলের দ্বারা স্পর্শনীয় স্থানের গ্রহণ করা উচিত। যা হচ্ছে কণ্ঠই(কোমল তালু) হয়। অতঃ কণ্ঠ এবং জিহ্বা মূলীয় শব্দ সমানর্থকই হলো।”

৭. উপপৃথ্বানীয়া ওষ্ঠ্যাঃ। অর্থাৎ - উ উ উত, প-বর্গ প ফ ব ভ ম এবং উপপৃথ্বানীয় (২ প/ফ) এদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ।

৮. অনুস্বারয়মা নাসিক্যাঃ। অর্থাৎ অনুস্বার এবং অক্ষর যম ব্যাতিত তিন যম (হ্রস্ব, দীর্ঘ, অনুনাসিক) এদের উচ্চারণ স্থান নাসিকা, অতঃ এদের উচ্চারণ নাসিকা স্থান থেকে করা উচিত।

৯. এদৈতৌ কণ্ঠ্যতালবৌ। অর্থাৎ এ ঐ এই দুই বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং তালু।

১০. ওদৌতৌ কণ্ঠ্যোষ্ঠৌ। অর্থাৎ ও ঔ এই দুই বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং ওষ্ঠ।

১১. ওঞণনমাঃ স্বস্থাননাসিকাস্থানাঃ। অর্থাৎ বর্গীয় বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণের পঞ্চম বর্ণ ও ঞ ণ ন ম এদের উচ্চারণ স্থান

স্বস্থান অর্থাৎ পূর্ব সূত্রে এদের যে নিজের স্থান বলা হয়েছে তা এবং এছাড়াও এরা নাসিকা স্থান দ্বারাও উচ্চারিত হয়।

কিছু সহজ নিয়ম

১. সংস্কৃতে ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘অ’-ই করা উচিত। বাংলায় যেভাবে ‘ও’-এর মতো এবং হ্রস্বের তুলনায় বেশি সময় নিয়ে উচ্চারণ করি, ঠিক সেভাবেই সংস্কৃতেও উচ্চারণ করে থাকি যা অনুচিত। এবং এর দীর্ঘ রূপ ‘আ’ এর উচ্চারণে দীর্ঘ সময় না দিয়ে, অনেকে হ্রস্বের সময় দিয়েই উচ্চারণ করেন যা অশুদ্ধ। এ ছাড়াও প্রত্যেক হ্রস্ব-স্বরের (অ, ই, উ, ঋ, লৃ) উচ্চারণ হ্রস্ব সময় এবং দীর্ঘ-স্বরের (আ, ঈ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ) উচ্চারণ দীর্ঘ সময় ধরেই করা উচিত। এবং হ্রস্বের তিনগুণ সময় ধরে প্লুত-স্বরের।

২. ‘ঋ’ এর উচ্চারণ নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত, কেউ ঋষি কে রুষি এর মতো আবার কেউ বা রিষি এর মতো উচ্চারণ করে। কিন্তু আমি পাণিনীয় শিক্ষা পড়ে যতটুকু অনুভব করেছি এর উচ্চারণ না তো ‘রু’- এর মতো হবে, না তো ‘রি’ এর মত হবে। কারণ এটি একটি স্বতন্ত্র স্বর তাহলে এতে কেন র্ ‘ই’ তালু বর্ণের উচ্চারণ হবে, আর কেনোই বা ‘উ’ ওষ্ঠ্য বর্ণের উচ্চারণ হবে। এটা তো ‘এ, ঐ, ও, ঔ’ এর মতো সন্ধি অক্ষরও নয় যে উচ্চারণের আদিতে

কণ্ঠশুদ্ধি

এবং অন্তে পরিবর্তন আসতে পারে। তাহলে কেন এর উচ্চারণের আদি এবং অন্তে ভিন্নতা আসবে? এর সমাধানে কোনো এক আচার্য বলেছেন যে “গ্রামাঞ্চলে ছাগলকে যেভাবে ডাকা হয় হ্র্র্রর্ ধ্বনি দ্বারা সেই ডাকের মধ্যবর্তী বা অন্তে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাই ‘ঋ’ এর ধ্বনি। এছাড়া ‘কর্ম’ শব্দটি উচ্চারণের প্রথম ‘ক’ কে এবং অন্তিম ‘ম’ কে বাদ দিলে মধ্যবর্তী কালের যে উচ্চারণ হয় ‘ঋ’ এর উচ্চারণ অনেকটাই এর মতো।

তবে সর্বাধিক প্রচলিত উচ্চারণ ‘রি’ এর মতোই হয়, তাই উদয়নাচার্যও তার শিক্ষা-শাস্ত্রমে এটাকে সর্বাধিক প্রচলিত হওয়ায় মান্য করেছেন। তবে এর কোনো প্রমাণ যুক্তি আদি প্রস্তুত করেন নি, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

৩. ৯(ল্) ঋ এবং ল্ (ল্) এই দুই বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে পূর্বেও সংশয় ছিল এবং বর্তমানেও আছে বলে উদয়নাচার্য তার শিক্ষা-শাস্ত্রমে তুলে ধরেছেন, এবং এর নির্দিষ্ট সমাধানও তিনি দেন নি। এর উচ্চারণ নিয়ে আমিও নিশ্চিত নই। তাই যতক্ষণ না এর নির্দিষ্ট সমাধান পাওয়া যায়, যা প্রচলনে আছে তাই স্বিকার করে নিতে হবে তা মূলত অনেকটা ল্ (Lri) তথা ল্রি এর মতো। শ্রী যুধিষ্ঠির মীমাংসক, তিনিও তার বর্ণোচ্চারণশিক্ষা চিন্তনমে লিখেছেন “ ‘ল্’

কণ্ঠশুদ্ধি

বলার সময় জিভ (জিহ্বা) ভিতরের দিকে বেঁকে যায়। ঠিক এই কারণেই একটু তোতলামির মতো শোনায়া।” এই বচন দ্বারাও বর্তমানে প্রচলিত যে উচ্চারণ সেটাই মনে হয়।

৪. **এ,ঐ,ও,ঔ** এই চারটি বর্ণ কে অনেকে প্রথমটিকে কম সময় এবং দ্বিতীয়টিকে বেশি সময় নিয়ে উচ্চারণ করেন, যথা **এ**-কে হ্রস্ব এবং **ঐ**-কে দীর্ঘ। যা অনুচিত কারণ এই চারটি বর্ণই দীর্ঘস্বর, এদের হ্রস্ব হয় না ‘সন্ধ্যাক্ষরাণাং হ্রস্বা ন সন্তি’। তাই এদের সবার উচ্চারণ দীর্ঘসময় ধরে করা উচিত।

৫. **ঐ**- এর শুদ্ধ উচ্চারণ ‘অই’ এর মতো এবং **ঔ**- এর উচ্চারণ ‘অউ’ এর মতো হয়।

৬. **ব্যঞ্জনবর্ণের** অন্তে স্বরবর্ণ থাকলেও আমরা বাংলার মতো হলন্ত (হসন্ত চিহ্ন যুক্ত) বর্ণের উচ্চারণ করি। যেমন **রাম=** **র্+আ+ম্+অ** এর অন্তে যে ‘অ’ আছে তার উচ্চারণ করি না, শুধু **র্+আ+ম্** উচ্চারণ করি যা অশুদ্ধ উচ্চারণ। যদি কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে হসন্ত চিহ্ন (্) না থাকে তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে ‘অ’ আছে এবং তার উচ্চারণ অবশ্যই করতে হবে।

৭. **ণ** – এর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে বারবার **ট,ঠ,ড** এই বর্ণগুলো উচ্চারণ করুন এবং অনুভব করুন, এদের উচ্চারণ যে স্থান(মূর্ধা)

কণ্ঠশুদ্ধি

থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সেই স্থান থেকেই ‘ণ’ এর উচ্চারণ শুদ্ধ হবে। সাবধানে মূর্ধা স্থানে জিহ্বা স্পর্শ করে বারবার উচ্চারণ করুন ট, ঠ, ড, ণ। তদ্রূপ -

৮. ন- এর উচ্চারণ শুদ্ধ করতে ত, থ, দ এই বর্ণগুলো যে দন্তস্থান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, সে স্থান থেকেই ‘ন’ এর উচ্চারণ করুন। সেই দন্ত স্থানে জিহ্বা স্পর্শ করে বারবার উচ্চারণ করুন ত, থ, দ, ন।

৯. য- এর শুদ্ধ উচ্চারণ ‘ইঅ’ হয়, কিন্তু ধ্যান দেওয়ার বিষয় হলো ‘ই’ এবং ‘অ’ এর উচ্চারণ যেন অতি শীঘ্রতার সাথে হয়। উদাহরণ – যদা যদা = ইঅদা ইঅদা। কর্মণ্যে = কর্মণ্ ইএ (ণিএ)। বিদ্যা = বিদ্ইআ (দিআ)।

১০. অন্তঃস্থ ব (ব)- এর শুদ্ধ উচ্চারণ ‘উঅ’ হবে, পূর্বের ন্যায় এটার উচ্চারণেও যেনো ‘উ’ এবং ‘অ’ এর উচ্চারণ শীঘ্রতার সাথে হয়। যেমন – বরদা = উঅরদা। বর্ণ = উঅর্ণ। ত্বমেব = তুঅ-মে-উঅ। বিদ্বান = উই-দুআ-না। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধ্যান রাখতে হবে সেটি হলো ব(ব) এর পূর্ব ধ্বনি ‘উ’ এবং পরবর্তী যেকোনো স্বর থাকুক না কেন তাদের সংযোগ যদি অতি শীঘ্রতার সহিত না করা হয়, তাহলে কখনোই ব-এর শুদ্ধ উচ্চারণ হবে না। সেভাবেই

কণ্ঠশুদ্ধি

য-এর পূর্ব ধ্বনি ‘ই’ এবং পরবর্তী স্বরের সংযোগ অতি শীঘ্রতার সহিত না করা হলে কখনোই এর উচ্চারণ শুদ্ধ হবে না।

১১. শ,ষ,স -এর শুদ্ধ উচ্চারণ –

- শ এর উচ্চারণ তালু স্থানে জিহ্বা কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে করা উচিত। সহজ ভাবে বললে চ,ছ,জ এই বর্ণগুলো যে স্থানে উচ্চারিত হয় সেই স্থান থেকেই ‘শ’ এর উচ্চারণ হবে। তাই এভাবে বারবার উচ্চারণ করুন চ,ছ,জ, শ।
- ষ এর উচ্চারণ মূর্ধা স্থানে জিহ্বা কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে করা উচিত। সহজ ভাবে বললে ট,ঠ,ড যে স্থানে উচ্চারিত হয় সেই স্থান থেকেই ‘ষ’ এর উচ্চারণ শুদ্ধ হবে। তাই এভাবে বারবার উচ্চারণ করুন – ট, ঠ, ড – ষ।
- স এর উচ্চারণ দন্তে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে করা উচিত। সহজ ভাবে বললে ত,থ,দ যে স্থানে উচ্চারিত হয় সেই স্থান থেকেই ‘স’ উচ্চারিত হবে। তাই এভাবে বারবার উচ্চারণ করে প্র্যাকটিস করতে পারেন ত,থ,দ -স।

১২. ঙ্গ- এর শুদ্ধ উচ্চারণ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে, তবে এর ‘জ্ ঞ্’ এটাই শুদ্ধ উচ্চারণ। অনেকে নানা কু-যুক্তি ও কুতর্ক

কণ্ঠশুদ্ধি

দিয়ে প্রমানিত করার চেষ্টা করেন যে এর উচ্চারণ গ্যঁ অথবা গ্য যা একদম ঠিক নয়।

১৩. হ্য- এর উচ্চারণ হবে ‘হিঅ’ (৯.১০ দেখুন) বাহ্য = বাহিঅ। একইভাবে চিহ্ এর উচ্চারণ চিন্ন নয় বরং চিহ্ ন।

১৪. ক্ষ-এই যুক্তবর্ণে হ্+ম্+অ এই তিন বর্ণ আছে। এর উচ্চারণ হবে হ্ মা ব্রক্ষ= ব্রহ্-মা ব্রক্ষা= ব্রহ্-মা।

১৫. ক্ষ- এই যুক্তবর্ণে ক্+ষ্+অ এই তিন বর্ণ আছে। এদের উচ্চারণও যথাযথ হওয়া উচিত। পরিক্ষা= পরিক্-ষা। ভিক্ষা= ভিক্-ষা। চক্ষু= চক্-ষু।

১৬. অনুস্বার (ং) এর উচ্চারণ অনেকে ‘ম্’ বলে কিন্তু যা শিক্ষা অনুসারে অশুদ্ধ। এর উচ্চারণ সাধারণ ভাবেই নাসিকা দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত নিচে লেখা হবে।

১৭. বিসর্জনীয় (বিসর্গ) (ঃ)- এর উচ্চারণ প্রায় ‘হ্’ এর মতো হয়। বলা হয়েছে ‘বায়োর্বিসর্জনে জন্যত্বাদ্ বিসর্জনীয়ঃ’ (তৈ০প্রা০-বৈ০আ০ ১.১৮) অর্থাৎ শীঘ্রতার সহিত বায়ুর বিসর্জন দ্বারা উৎপন্ন বর্ণকে বিসর্জনীয় বলে। একে বিসর্গও বলা হয় বিসর্গ শব্দটি ‘সৃজ বিসর্গে’ ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বিপূর্বক সৃজ্-ধাতুর

কণ্ঠশুদ্ধি

অর্থ হয় বিসর্জন, ত্যাগ করা। এটি স্বরাশ্রিত বর্ণ অতঃ যে স্বরের পরে বিসর্গ থাকে তার রূপ কে গ্রহণ করে। এবিষয়ে উদাহরণ সহ লঘুমাধ্যন্দিরীয় শিক্ষায় বলা হয়েছে –

দেবো বঃ সবিতা চাত্র হকারসদৃশো ভবেৎ।

এখানে দেবঃ এর বিসর্গ হ-কারের সদৃশ হবে।

দেবীভিস্ত্রো বিসর্গস্তু হিকারসদৃশো ভবেৎ।

দেবীঃ শব্দের বিসর্গ হি-কার সদৃশ হবে।

আখুন্তে পশুরিত্যাদৌ ল্কারসদৃশো ভবেৎ।

আখুঃ, পশুঃ শব্দের বিসর্গ ল্-কারের সদৃশ হবে।

বিসর্গশ্চাগ্নেরিত্যাদৌ হেকারসদৃশো ভবেৎ।

অগ্নেঃ শব্দের বিসর্গ হে-কারের সদৃশ হবে।

বিসর্গো বাহুরিত্যাদৌ হোকারসদৃশো ভবেৎ।

বাহুঃ শব্দের বিসর্গ হো-কারের সদৃশ হবে।

অথ স্বৈর্দৃক্ষেরিত্যাদৌ হিকারসদৃশো ভবেৎ।

স্বৈঃ, দৃক্ষৈঃ শব্দের বিসর্গ হি-কারের সদৃশ হবে।

বিসর্গো দৌষ্পিতেত্যাদৌ ল্কারসদৃশো ভবেৎ

কণ্ঠশুদ্ধি

দৌঃ শব্দের বিসর্গ হ্রস্বের সদৃশ হবে। এমন ভাবেই বিসর্গের উচ্চারণ জানা উচিত। আরো কিছু সহজ বোধগম্য উদাহরণ –
রামঃ= রামহ্ , হরিঃ= হরিহি, গুরুঃ= গুরুহ্, অগ্নেঃ= অগ্নেহে,
বাহোঃ= বাহোহো, দ্যৌঃ= দ্যৌহ্, রামৈঃ= রামৈহি।

১৮. জিহ্বামূলীয় (ঃ) এটি মূলত ক এবং খ বর্ণের পূর্বে থাকে। এর উচ্চারণ অনেকেই বিসর্গের মতোই স্বিকার করেছেন। এছাড়াও উদয়নাচার্য তার শিক্ষাতত্ত্বালোকভাষ্যে লিখেছেন “যেখানে যেখানে স্থান রূপে ‘জিহ্ব্য’ বা ‘জিহ্বামূল’ এর উল্লেখ আছে, সেখানে জিহ্বামূলের দ্বারা স্পর্শনীয় স্থানের গ্রহণ করা উচিত। যা কণ্ঠ-ই (কোমল তালু) হয়। অতঃ কণ্ঠ্য এবং জিহ্বামূলীয় শব্দ সমার্থক-ই হলো। এটাতে শুধু এতোটুকুই পার্থক্য যে একটাতে স্থানের প্রাধান্য অন্যটিতে সাধন(করণ) এর প্রাধান্যতা আছে। কণ্ঠ (কোমল তালু) এবং জিহ্বামূল অবয়ব অত্যাধিক নিকটে হওয়ার কারণেই কণ্ঠ্য এবং জিহ্বামূলীয় স্থানের একার্থতা এসেছে।” [পৃষ্ঠা -৯৫]।

১৯. উপস্থানীয় (ঃ) এটি মূলত প-কার এবং ফ-কারের পূর্বে থাকে। এর উচ্চারণ স্থান বলা হয়েছে ওষ্ঠ্য (পা০শি০ ১/১৫)। উদয়নাচার্য লিখেছেন “উপস্থানেন জন্যত্বাদ্ উপস্থানীয়ঃ ”

কণ্ঠশুদ্ধি

(তৈ০প্রা০ ১.১৮) অর্থাৎ দীপক ইত্যাদি নেভানোর সময় যেমন ফুঁ দেওয়া হয়, তেমনি ফুঁ দেওয়ার মতো প্রয়োত্ন (চেষ্টা) দ্বারা উপস্থানীয় (স) এই বর্ণের উৎপত্তি হওয়ার কারণে তাকে উপস্থানীয় বলে। জিহ্বামূলীয় এবং উপস্থানীয় কে অর্ধ বিসর্গ বা অর্ধ বিসর্জনীয়ও বলে।

২০. হ্রস্ব (ঞ) যম এর উচ্চারণ সাধারণ ভাবেই অনুস্বারের মতোই হয়। অনেকেই বলে থাকেন কাসার থালায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয় তেমনি এই বর্ণের উচ্চারণ হবে। শুধু ধ্যান রাখতে হবে এটি হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রা সময় কাল ধরে এর উচ্চারণ হবে।

২১. দীর্ঘ (ং) যম এর উচ্চারণ হ্রস্ব যম (ঞ) এর মতোই হয়। কিন্তু এটি দীর্ঘ তাই দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ দুই মাত্রা সময় কাল ধরে এর উচ্চারণ হবে।

২২. অনুনাসিক (ঁ) এটি সাধারণত নাসিকা দ্বারা উচ্চারণ হয়। এটা যে বর্ণের সাথে থাকে সেই বর্ণের সাথে সংযুক্ত স্বরকে সানুনাসিক অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা উচ্চারণ করতে হবে। উদাহরণ চাঁদ এখানে চ্ এর সাথে যে আ আছে একে সানুনাসিক অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা (আঁ) উচ্চারণ করলেই হবে।

২৩. অক্ষর (ळ) যম এটির উচ্চারণ মূলত পরম্পরা গত ভাবে যে উচ্চারণ প্রাপ্ত হয় তা প্রায় ল্ এবং ড এর সংযোগে মিলিত একটি ধ্বনি। অনেক আচার্য বলেন এর উচ্চারণ মূলত জিহ্বাকে উপর থেকে নিচে আছাড় মেরে উৎপন্ন করতে হয়। যেমন অগ্নিমিচ্ছ এ এর উচ্চারণ যেভাবে শোনা যায় এবং আচার্য গণ বলেন তার লিখে প্রকাশ করা একদমই অসম্ভব।

অনুস্বার উচ্চারণের সমীক্ষা

অনুস্বারের উচ্চারণ অনেকেই বলেন যে ম্ এর মতো হবে। যা কোনোভাবেই শুদ্ধ নয়। এর উচ্চারণ সাধারণ ভাবেই নাসিকা দ্বারাই করা উচিত। এর উচ্চারণ ‘ম্’ কেনো অশুদ্ধ? দেখুন ম্-এর উচ্চারণ স্থান হচ্ছে ওষ্ঠ্য এবং নাসিকা (উপূপদ্ব্যনীয়্য ওষ্ঠ্য্যঃ, ঙ্গণনমাঃ স্বস্থাননাসিকাস্থানাঃ) এবং অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান হচ্ছে নাসিকা (অনুস্বারযমা নাসিক্য্যঃ) তাহলে কি করে একটি নাসিকা স্থানীয় বর্ণকে ওষ্ঠ্য স্থানে উচ্চারণ করা যায়? স্থান ভিন্ন হওয়ায় অনুস্বারের উচ্চারণ ‘ম্’ করা অশুদ্ধ।

অনেকে অষ্টাধ্যায়ীর ‘মোহনুস্বারঃ’ সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন অনুস্বারের উচ্চারণ ‘ম্’ । কিন্তু সেই সূত্রে বলা

কণ্ঠশুদ্ধি

হয়েছে যে ম-কারের পরে যদি ব্যাঞ্জনবর্ণ থাকে তাহলে সেই ম-কার অনুস্বারে পরিবর্তন হবে। যেমন – অহম্ গচ্ছামি= অহং গচ্ছামি। পূর্ব পক্ষকে আমার প্রশ্ন ম-কার যখন অনুস্বারে পরিবর্তিত হয়েই গেল তাহলে সেই পরিবর্তিত অনুস্বারের উচ্চারণ পূর্বে স্থিত ‘ম্’ কেনো হবে? তাই আমার স্পষ্ট অভিমত অনুস্বারের উচ্চারণ ‘ম্’ নয়। যদি ম্ উচ্চারণ করা হয় তাহলে বুঝতে হবে অনুস্বারের উচ্চারণ হয়নি বরং ম-কার উচ্চারণ হয়েছে।

তবে এর উচ্চারণ ক-বর্ণের নাসিক্য বর্ণ ‘ঙ’ এর মতো বলা যায় আমার স্ব-অভিমত, এর কারণ প্রস্তুত করছি – কারণ হচ্ছে পাণিনীয় শিক্ষায় অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান যেখানে নাসিকা বলা হয়েছে ঠিক তার পরেই মুনিবর একটি ভিন্ন আচার্যের অভিমত দিয়েছেন ‘কণ্ঠ্যনাসিক্যমनुस्वारमेके’ অর্থাৎ - কিছু আচার্য অনুস্বারকে কণ্ঠ্য এবং নাসিকা স্থানীয় মানেন। অর্থাৎ বলা যায় ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কার্য করার সময় এর স্থান কেবল নাসিক্য হলেও কিছু আচার্য উচ্চারণার্থে কণ্ঠ্য এবং নাসিকা দুই স্থান মেনেছেন। এবার আসুন দেখি ঙ, ঞ, ণ, ন, ম এদের মধ্যে নাসিকা এবং কণ্ঠ্য স্থানীয় বর্ণ কোনটি? অবশ্যই উত্তর হবে ‘ঙ’ । এছাড়াও

কণ্ঠশুদ্ধি

সাধারণত নাসিক্য ধ্বনি উৎপন্ন করার চেষ্টা করলে ‘ঙ’এর মতোই ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এজন্য বলা যায় অনুস্বারের উচ্চারণ প্রায় ক-বর্গের পঞ্চম নাসিক্য বর্ণ ‘ঙ’ এর মতো।

কিছু সন্ধি উচ্চারণ নিয়ম

সন্ধি নিয়ম কখন প্রয়োগ হয়?

উত্তর - যখন সংহিতা হয়। **সংহিতা কী?** পরঃসন্ধিক্ষঃ সংহিতা অর্থাৎ বর্ণের অত্যন্ত নিকট অবস্থা হলো সংহিতা। যেমন- অহম্ পঠামি! অহম্ এবং পঠামি দুইটি শব্দকে যদি একসাথে বলতে চাই তাহলে তাকে সংহিতা বলা হয়। এবং সংহিতা করতে হলে ‘সংহিতায়াম্’ অধিকারের অন্তর্গত যে সন্ধি আদি নিয়ম তা পালন করতে হবে। অর্থাৎ এখানে ‘মোহনুস্বার’ সূত্রের নিয়ম অনুসারে প্রথম পদের অন্তিম ম-কারকে অনুস্বার করতে হবে। যথা **অহম্ পঠামি → অহং পঠামি**। এবং এর পরবর্তীতে যদি এখানে দ্বিতীয় সন্ধি নিয়ম প্রয়োগ করতে চাই তাও করতে পারি। তা হচ্ছে- অনুস্বারের পরে যে ব্যাঞ্জনবর্ণ আছে তার সর্বর্ণকে আদেশ (গ্রহণ)

কণ্ঠশুদ্ধি

করতে হয়। ‘অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ’ এই সূত্র অপদান্ত (পদের মধ্যে অবস্থিত অনুস্বার) অনুস্বারের স্থানে সবর্ণ আদেশ করার কথা বলে। যেমন অং+ক→ অঙ্ক। অং+চনম্→ অঞ্চনম্। বং+টনম্→ বটনম্। অং+তিতঃ→ অত্তিতঃ। কং+পনম্→ কম্পনম্ ইত্যাদি।

এবং ‘বা পদান্তস্য’ সূত্র দ্বারা বিকল্পে (ঐচ্ছিক) পদান্ত (পদের অন্তে স্থিত) অনুস্বারের স্থানে অনুস্বারের পরবর্তী বর্ণের সবর্ণ আদেশ হয়। যেমন— কটং করোতি→ কটঙ্করোতি। (এখানে পদান্ত অনুস্বারের পশ্চাতে ক্ আছে তাহলে ক-কারের নাসিকা স্থানীয় সবর্ণকে (ঙ) গ্রহণ করতে হবে।) গ্রামং টীকতে→ গ্রামণ্টীকতে। নদীং তরতি→ নদীন্তরতি ইত্যাদি।

সবর্ণ কাকে বলে ? তুল্যস্য প্রয়ত্নম্ সবর্ণম্। অর্থাৎ সমান প্রয়ত্ন (স্থান, করণ ইত্যাদি বিষয়) যুক্ত বর্ণকে সবর্ণ বলে, এছাড়াও বলা হয়েছে ‘বর্গেয়া বর্গেণ সবর্ণঃ’ অর্থাৎ প্রত্যেক নিজ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়, যেমন ক-বর্ণের ক,খ,গ,ঘ,ঙ এরা পরস্পর সবর্ণ।

কণ্ঠশুদ্ধি

যথা রূপ চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ সমূহের নিজ বর্গের প্রত্যেক বর্ণ সর্বাঙ্গ । কিন্তু প্রত্যেক বর্গের বর্ণের মধ্যে কেবল বর্গের পঞ্চম বর্ণে নাসিক্য গুণ থাকে তাই অনুস্বারের স্থানে কেবল ক-বর্গের ঙ্, চ-বর্গের ঞ্, ট-বর্গের ণ্, ত-বর্গের ন্, প-বর্গের ম্ কে গ্রহণ করা উচিত। যেমন – ‘অহং পঠামি’ এখানে অনুস্বারের পরে প-কার আছে তাই প বর্গের নাসিক্য বর্ণ ম্ তাই ম্ গ্রহণ করেও উচ্চারণ করা যায় অহং পঠামি→ অহম্পঠামি । ‘অহং গচ্ছামি’ এখানে অনুস্বারের পরে গ-কার আছে তাই ক-বর্গের নাসিক্য বর্ণ ঙ্ গ্রহণ করে হবে অহঙ্ গচ্ছামি → অহঙ্গচ্ছামি ।

এছাড়াও পাণিনীয় শিক্ষা অনুসারে অন্তঃস্থ বর্ণের দুই ভেদ (পার্থক্য) হয়, সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক । সানুনাসিক অর্থাৎ যার মধ্যে নাসিক্য গুণ রয়েছে নিরনুনাসিক অর্থাৎ যার মধ্যে নাসিক্য গুণ নেই। [অন্তঃস্থা দ্বিপ্রভেদা রেফবর্জিতাঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ] কিন্তু অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে রেফ অর্থাৎ ‘র্’ এর সানুনাসিক ভেদ হয় না কারন বলা হয়েছে “রেফবর্জিতাঃ” এই জন্য – রেফোঋণাম্ সর্বাঙ্গা ন সন্তি। রেফ (র) এবং ঊষ্ম শ, ষ, স, হ বর্ণ সমূহের সর্বাঙ্গ হয় না।

ক্রমানুসারে নিরনুনাসিক- য, ল, ব (ব)

কণ্ঠশুদ্ধি

সানুনাসিক- যঁ, লঁ, বঁ (वँ)

অর্থাৎ এরা একে অপরের সর্গি।

অর্থাৎ অনুস্বারের পরে যদি য-কার থাকে তাহলে অনুস্বারের স্থানে য-কারের সানুনাসিক (সর্গি) ‘ যঁ ’ গ্রহণ হবে, ল-কার থাকলে ‘ লঁ ’ গ্রহণ হবে এবং ব-কার (व) থাকলে বঁ (वँ) হবে।

উদাহরণ –

সং যন্তা = সয়ঁ যন্তা

ত্র্যয়স্বকং যজামহে = ত্র্যয়স্বকয়ঁ যজামহে

সং বৎসরম্ = সবঁ বৎসরম্ (व > वँ)

য়ং লোকম্ = যলঁ লোকম্ ইত্যাদি

বিসর্গ সন্ধি উচ্চারণ নিয়ম

বিসর্গের পরে যদি শ,ষ,স থাকে তাহলে বিসর্গের স্থানে ক্রমানুসারে

শ্, ষ্, স্ হবে। যেমন –

শান্তিঃ শান্তিঃ = শান্তিশ্ শান্তিঃ

কণ্ঠশুদ্ধি

কবয়ঃ ষট্ = কবয়ষ্ ষট্

ধার্মিকাঃ সন্তু = ধার্মিকাস্ সন্তু ইত্যাদি

এছাড়াও বিসর্গের পরে যদি ক,খ থাকে তাহলে বিকল্প করে (ঐচ্ছিক) জিহ্বামূলীয় করা যেতে পারে যেমন – পুরুষঃ করোতি= পুরুষঃ করোতি। এবং বিসর্গের পরে যদি প,ফ থাকে তাহলে উপস্থানীয় হবে। যেমন – পুরুষঃ পঠতি= পুরুষঃ পঠতি ইত্যাদি। এদের উচ্চারণ উপরে লেখা হয়েছে।

এর ব্যাতিত সন্ধি নিয়ম অনেক রয়েছে কিন্তু সর্বাধিক প্রচলিত এবং ব্যবহৃত যা নিয়ম সমস্ত কিছুই দেওয়া হয়েছে। এর অতিরিক্ত না লিখে সমস্ত পাঠকের সুবিধার্থে এটি এখানেই সমাপ্ত করা হলো।

ধন্যবাদ

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত ই-বুক সমূহ

- কণ্ঠশুদ্ধি – সংস্কৃত শুদ্ধ উচ্চারণের সরলতম বিধি।
- বদতু মধুরসংস্কৃতম্ – প্রারম্ভিক ব্যক্তি তথা শিশুদের জন্য।
- শ্লোকামৃতমালা – প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় শ্লোক সম্মিলিত।
- ঈশ্বরস্তুতিপ্রার্থনোপাসনা মন্ত্রোচ্চারণ সরলবিধি।
- ধর্মশিক্ষা – ধর্মের পথে, স্বর্গের পথে।



“ વિદ્યા વધુ જાનો વિદેશ ગમતે ”

